প্রাথমিক শিক্ষা
কোন পথে

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস পথের পাঁচালী। এ উপন্যাসে শিশু অপুর নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা দানের প্রাণবন্ত বর্ণনা রয়েছে।

সত্যজিৎ রায় রুপালি পর্দায় তা হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। মুদি দোকানের পাশে খোলা ঘরে মাটির মাদুর পেতে অপু অন্য ছাত্রদের সঙ্গে বসতো। প্রসন্ন গুরু মহাশয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে গল্প গুজব করছেন। একই সঙ্গে কঠোর দৃষ্টি রাখছেন ছাত্রদের ওপর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আমার ছেলেবেলা প্রবন্ধে জমিদার বাড়ির শিশুদের সঙ্গে তার শিক্ষা গ্রহণের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার ছেলেবেলায় ফুটে উঠেছে উনিশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র। অথচ এ সময় অবকাঠামোহীন স্কুলগুলোতে একজন আদর্শ শিক্ষকের হাত ধরে প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়েছে। এ শিক্ষা গ্রহণ করেই বাংলায় কালজয়ী মানুষের জন্ম হয়েছে। অথচ গত অর্ধ শতাব্দী ধরে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে নানা ধরনের পরিকল্পনা। মহাকর্মযজ্ঞ। বাস্তবে প্রাথমিক শিক্ষার তেমন অগ্রগতি নেই।

স্বাধীনতার পরই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে '৭৩ সালে প্রাথমিক স্কুল টেকিং ওভার অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। এজন্য দেশের সব প্রাথমিক স্কুলকে অধিগ্রহণ করা হয়। ৩৬ হাজার স্কুলকে একই সঙ্গে জাতীয়করণ করা হয়। এ সময়ে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেয়া হয়। ৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়। তারপরও প্রতিটি সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে নিয়েছে ব্যয়বহুল প্রকল্প। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে '৯২ সালে খোলা হয় একটি আলাদা বিভাগ। পরে এ বিভাগ মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। '৯৮ সালে নেয়া হয় কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প নামে পঞ্চ বার্ষিকী একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের অর্জন যাচাই না করে, আবারো প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ২ নামে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের অর্ধেক অর্থ আসছে ঋণের টাকায়। প্রকল্পের ৭০ শতাংশ অবকাঠামো খাতে ব্যয় হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে কি আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে! প্রকল্পের সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ও ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকার সম্মেলনের ঘোষণা পর্বের সঙ্গে মিল রয়েছে। গেখা গেছে, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার শিক্ষানীতির সঙ্গে সমন্বয় করে নেয়া হয়নি এ প্রকল্প।

ব্যয়বহুল প্রকল্পেও অর্জিত হয়নি আকাঙ্ক্ষিত সাক্ষরতার হার

দেশে সাক্ষরতার প্রকৃত হার কত? এ নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছে। সরকার বলছে ৬২ শতাংশের ওপরে, অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের ঐক্যপ্রতিষ্ঠান গণসাক্ষরতা অভিযান তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী বলছে এ হার ৪১.৪ শতাংশ। অবশ্য এ হার ১১ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০২-এ দাবি করা হয়েছে যে, এ গবেষণা-সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। সারাদেশে জরিপের ভিত্তিতে এটা প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের ২শ' ৬৮টি গ্রাম ও মহল্লার ৩ হাজার ৮৪০টি পরিবার থেকে ১৩ হাজার ১শ' ৪৫ জন লোকের মধ্যে সাক্ষরতা পরিমাপ করা হয়। দেশে ১১ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী লোকের সংখ্যা ৯.৩ কোটি। এদের মধ্যে ৪.৬ কোটি লোক নিরক্ষর। ৩.৮ কোটি লোক সাক্ষর। ১২ শতাংশের বেশি ব্যবধানে নারীরা পিছিয়ে আছে পুরুষদের তুলনায়। নারী সাক্ষরতার হার ৩৫.৬ শতাংশ এবং পুরুষ ৪৭.৬ শতাংশ। গ্রাম-শহরের মধ্যে সাক্ষরতার ব্যবধান রয়েছে। শহরের চেয়ে ২৬ শতাংশ ব্যবধানে পিছিয়ে আছে গ্রামীণ সাক্ষরতার হার। গ্রামে সাক্ষরতার হার ৩৭.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে এ হার ৬৩.৬ শতাংশ। রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, ৩৮ শতাংশ পরিবারে একজনও সাক্ষর লোক

এক নজরে প্রকল্প

প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প ২
বাস্তবায়নের কাল : জুলাই ২০০৩- জুন ২০০৯
প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্পের মোট ব্যয় : ৬৫৪ মিলিয়ন ডলার, ৪৯৩৩ কোটি টাকা (প্রায়)
প্রতি ডলার : ৫৭.৯০ টাকা ধরে
প্রকল্পের অর্থায়ন
স্থানীয় সম্পদ : ১২৩৩২৭ লাখ টাকা
বৈদেশিক সম্পদ : ২২৫২৩১ লাখ টাকা
উন্নয়ন সহযোগী দেশ
বিশ্বব্যাংক (ঋণ) : ১৫০ মি. ডলার (২৩.৪৯)
এডিবি (ঋণ) : ১০০ মি. ডলার (১৫.৬৫%)
ডিএফআইডি (অনুদান) : ১৫০ মি. ডলার (২৩.৪৭%)
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (অনুদান) : ১০০ মি.ডলার (১৫.৬৫%)
নেদারল্যান্ডস (অনুদান) : ৫০ মি. ডলার (৭.৮৫%)
নেরোড (অনুদান) : ৪০ মি. ডলার (৬.২৬%)
সুইডিশ সিডা (অনুদান) : ২৯ মি. ডলার (৪.৫৪%)
কানাডিয়ান সিডা (অনুদান) : ২০ মি. ডলার (৩.১৪%)
এছাড়া ইউনিসেফ/ অস্ট্রেলিয়া ১২ মিলিয়ন এবং জ্যামাইকা ৩ মিলিয়ন ডলার প্যারালাল অর্থায়ন করবে।
ব্যয়ের খাত
জনবল (বেতন-ভাতা) : ৬৬২ কোটি
ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ : ১৯৪৭ কোটি
যানবাহন : ১৮ কোটি
কম্পিউটার : ৩৩ কোটি
আসবাবপত্র : ১৭৬ কোটি
পরামর্শক (বিদেশী) : ৯৪ কোটি
স্থানীয় : ২৩ কোটি

নেই। আবার তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার পরও এক শতাংশ শিশু সাক্ষরতা অর্জন করতে পারেনি। শিক্ষার মান কেমন তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দাবি করা হয়েছে এ হার ৬২.৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদনে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের সাক্ষরতার হার ৪৭.৫ শতাংশ বলা হয়েছে।

ইউনেস্কোর হিসাবে মতে ১৯৯০ সালে সারা পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিলো ৯.৬২ কোটি, ১৯৯৫ সালে ৮.৮৫ কোটি এবং ২০০০ সালে ৮.৮৭ কোটি। এই মোট নিরক্ষরের ২৭ শতাংশ বয়স্ক নিরক্ষর হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশে। এর মধ্যে মহিলারা হচ্ছে তিন ভাগের দুই ভাগ। সারা বিশ্বের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ৭১ শতাংশ হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। আর বাংলাদেশে ৬০ শতাংশ লোক নিরক্ষর। অথচ নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রতি বছর উচ্চাভিলাষী প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় : বাড়ছে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে, শিক্ষা ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বাজারের ওপর। এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতির অবস্থা নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে শিক্ষা নিয়ে সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলো নানা কাজ করছে, আবার বিশ্বব্যাপী শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন সংগঠনগুলোরও চিন্তার কমতি নেই শিক্ষা নিয়ে। কাজও হচ্ছে কম-বেশি। শিক্ষা বিষয়ে নীতি প্রণয়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় রয়েছে। সরকারের প্রচেষ্টা, দাতাদের আনুকূল্য সবই আছে। কিন্তু সত্য যে, অনেকে শিক্ষা পাচ্ছে না, মানসম্মত শিক্ষা তো নয়ই। শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষ। বিশেষ করে মেয়ে শিশু ও মহিলারা। মেয়েদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে বটে, কিন্তু অসচেতনতা ও নানাবিধ সামাজিক কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরো সক্রিয় হওয়া দরকার, আরো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। দরকার নীতি প্রণয়নসহ নীতি বাস্তবায়ন। শিক্ষা সবার অধিকার। সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষা পাচ্ছে না। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সময় শিক্ষার্থীরা শিকার হচ্ছে নানা নির্যাতনের। আবার যে বিশালসংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না বা যারা নিরক্ষর তাদের জন্য বেসরকারি সংগঠনগুলোর রয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। এরপরও অনেক শিশু সুযোগ পাচ্ছে না। ৯৬% প্রতিবন্ধী শিশু পড়াশুনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ নেই। গ্রাম ও শহরের শিশুদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা বৈষম্য। আমরা সংবিধান, আইনি কাঠামো ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিক্ষা নিয়ে কিছু নীতি-নির্দেশনার উল্লেখ করতে পারি। শিক্ষা সর্বজনীন মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সংবিধান ও আইনে নারীর জন্য সমতাভিত্তিক শিক্ষা, গুণগত ও সমমানের শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক এই স্বীকৃতি বিভিন্ন সময়ে সরকার প্রণীত নীতিমালাসমূহ, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি সকল

‘এটা কোনো প্রথাগত রিপোর্ট নয়’

প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান মিঞা
চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

সাপ্তাহিক ২০০০ : শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে প্রাইমারি শিক্ষার বিষয়টিকে আপনারা কিভাবে দেখছেন?

মনিরুজ্জামান মিঞা : প্রাইমারি শিক্ষার বিষয়টিতে আমরা বলেছি ৫ বছর মেয়াদী সব শিশুকে আনতে হবে। যার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে। বছরের যেকোনো সময় এটা হতে পারে। তারপর গুণগত মানের ব্যাপারে বলেছি। গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ জরুরি। আর এজন্য একটি টিভি চ্যানেল করার কথা সুপারিশ করেছি। স্কুলকে হতে হবে আরো আকর্ষণীয়। বিনোদন, খেলাধুলার পরিপূর্ণ সুযোগ থাকতে হবে। আরেকটি বিষয় আমরা খুব জোর দিয়ে বলেছি, তা হলো শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো একটি সংস্থা গঠন করতে পারে। ফলে হবে কি, প্রাইমারি শিক্ষকদের নানাবিধ হয়রানি কমবে। আর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা ক্রমান্বয়ে মহিলা শিক্ষক যোগ্যতার ভিত্তিতে ৬০ ভাগে উন্নীত করার কথা বলেছি। পাশাপাশি ওপেন লারনিংয়ের জন্য পুরো একটি চ্যানেল চালু করার কথা বলেছি। এতে হবে কি, প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে টেলিভিশন থাকলে টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন লারনিং প্রোগ্রাম দেখে তারা শিখতে পারবে। যেমন ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল যেভাবে বিভিন্ন শিক্ষা ও বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম দেখায়, সে ধরনের প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে এ লারনিং চ্যানেলে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং কমিটি করার কথা উল্লেখ করেছি। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সঙ্গে দু'জন যোগ করার পরামর্শ দিয়েছি। এ দু'জন হবে এলাকার চিকিৎসক অথবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা সম্মানিত ব্যক্তি।

২০০০ : কিন্তু স্বাধীনতার পর কোনো শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। সে ক্ষেত্রে এ রিপোর্টের বাস্তবায়ন নিয়ে আপনি কতোটা আশাবাদী?

মনিরুজ্জামান মিঞা : আমরা রিপোর্ট জমা দিয়েছি ৩১ মার্চ। এটা বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াধীন আছে। সরকার বদলায়, কমিশনের রিপোর্ট নতুন করে তৈরি হয়। ফলে কোনো রিপোর্টই বাস্তবায়ন হয় না। এজন্য আমি সরকারকে বলেছি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করার ব্যাপারে। এ কমিশন নিজের মতো চলবে। আর তারা গবেষণা করবে। শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মনিটরিং করবে, খোঁজ-খবর নেবে। তাহলে হবে কি, বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

২০০০ : কিন্তু আমাদের এখানে প্রাইমারি শিক্ষায় তিন ধরনের শিক্ষা বিদ্যমান। এ তিন ধরনের শিক্ষার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

মনিরুজ্জামান মিঞা : তিন ধরনের শিক্ষাদান তো এখন থেকে শুরু হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আর এখন তো বিদ্যমান স্পষ্টভাবে। এটা তো একবারেই শেষ করা সম্ভব নয়। করতে হবে ধীরে ধীরে, একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আমরা আমাদের কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষার যে সিলেবাস আছে তার সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান আবশ্যক বিষয় হিসেবে পড়ানোর সুপারিশ করেছি। তা আগে কোনো কমিশন করেনি।

‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে নিয়ে আসতে হবে’

অধ্যাপক আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক
সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কি?

অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক : শিক্ষকদের যদি উন্নয়ন না করা হয় তাহলে এ শিক্ষা কোনো কাজে আসবে না। উন্নয়ন বলতে প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক আছে, তারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চেয়ে বেতন কম পায়। অনেকে আবার এ বেতনও পাচ্ছে না অনেক দিন ধরে। বেতন কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে বেতন যেহেতু চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ে কম পাচ্ছে, তারা ছাত্র-ছাত্রীদেরও চতুর্থ শ্রেণীর লেখাপড়া করায়। একমুখী শিক্ষায় নিয়ে আসতে হবে। স্কুল, মাদ্রাসায়, মূল প্রবাহের শিক্ষা ব্যবস্থা এক থাকা উচিত। আমাদের শিক্ষকদের মান খারাপ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা আরো খারাপ। শিক্ষকের মান খারাপ হলে শিক্ষার মানও খারাপ হবে। আলাদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বেতন, মানমর্যাদা বাড়াতে হবে। একজন শিক্ষক যদি মাসে ১৭০০-১৮০০ টাকা বেতন পায়, সেখানে শিক্ষার মানোন্নয়ন হয় কীভাবে! আর রাজনৈতিক দলীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ফলে কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক এ পেশায় চলে আসছে। ফলে শিক্ষার মানও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই আলাদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে ভালো বেতন দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ করতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলগুলো সরকারি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে সময়োপযোগী করে তৈরি করতে হবে। যাতে করে একটি শিশু স্কুলে আসে এবং পড়ালেখায় মনোযোগী হয়। স্কুল থেকে বড় একটা সংখ্যা ঝরে যাচ্ছে, তার মূল কারণ দারিদ্র্য। অভিভাবক দরিদ্র হওয়ার ফলে তারা মনে করে আমার সন্তান এখন আয়-রোজগার করতে পারবে। আয় করলে আমার ওপর চাপ কমবে। এমন চিন্তা করে সন্তানদের স্কুলে না দিয়ে কাজে পাঠায়।

২০০০ : তাহলে কি করতে হবে?

আরেফিন সিদ্দিক : অভিভাবকদের কাউন্সিলিং করতে হবে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে আনতে হবে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের। প্রয়োজনে স্কুলগুলোতে বইয়ের পাশাপাশি দুপুরের খাবার কিংবা কাগজ-কলম এমনকি পরীক্ষার ফি ফ্রি করে দিতে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চাদের কাপড় দিয়ে অভিভাবকের চাপ কমিয়ে এদের স্কুলমুখী করতে হবে। থানা, উপজেলা, জেলা শিক্ষা অফিসাররা এ বিষয়গুলো দেখাশোনা করবে। প্রথম প্রায়োরিটি দিতে হবে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার বেতন কাঠামো সমান করার বিষয়টি। ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। অবকাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য বিষয়ের দিকে নজর দিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে নজর দেয়া হয় না।

প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৯০ সালে জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত সর্বজনীন বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন, ১৯৯৫ সালে বেইজিং ঘোষণা এবং ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ‘সবার জন্য শিক্ষা’ ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন। সরকার ২০০৫ সালের মধ্যে সকল বিদ্যালয়ে সমানসংখ্যক ছেলেমেয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

দেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৭, ক, খ, গ)। আরো বলা হয়েছে, রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য।

একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল ছেলে-মেয়েকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য, সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ফলে দেখা যায়, সংবিধান সকল শিশুর জন্য বাস্তবমুখী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে যার দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। আবার আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিভিন্ন নীতিমালায় মেয়েদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ডাকার কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনায় মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করার তাগিদ অনুভব করেছে। যেমন, ডাকার কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ধারা ও অনুচ্ছেদে নারী শিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে ডাকার কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য, যেখানে নারী শিক্ষা প্রসারে ও নারী-পুরুষ সমতা বিধানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মোট ৬টি লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে প্রায় প্রতিটিতেই নারী শিক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে এবং ৫ নং লক্ষ্য সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে।

বলা হয়েছে, ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করতে হবে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে এ বিষয়ে সমতা অর্জন করতে হবে। মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অর্জনে মেয়েদের পূর্ণ ও সমপ্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ওপর জোর দিতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৭.৫, ডাকার কর্ম পরিকল্পনা)

২০১৫ সালের মধ্যে যাতে সব শিশু শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষত মেয়ে শিশু, যেসব শিশু সংকটময় অবস্থায় জীবনযাপন করছে বা বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত শিশু সকলেই যাতে বিনা ব্যয়ে মানসম্মত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তা সম্পূর্ণ করতে পারে এটা নিশ্চিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৭.২, ডাকার কর্মপরিকল্পনা)

বিশেষত নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক নিরক্ষরতা ৫০% কমিয়ে আনতে হবে এবং সকল বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষালাভের সমান প্রবেশাধিকার অর্জন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৭.৪, ডাকার কর্মপরিকল্পনা)

বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশকিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগের চেয়ে বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার গত ক’বছরে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে। কিন্তু স্কুলের পাঠ শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে অনেকে। এর পেছনে রয়েছে নানা সামাজিক কারণ ও প্রতিবন্ধকতা, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক দুরবস্থা তো আছেই। ফলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও সব মিলিয়ে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন

এখনো সুদূরপরাহত। প্রশ্ন হলো, সরকারের এতো উদ্যোগ, বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মকান্ড, বিদেশী দাতা সংস্থাগুলোর অনুদান মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে এবং বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কী কোনো কাজে আসেনি? নানা উদ্যোগের পরও নারী পুরুষের শিক্ষা বৈষম্য বাড়ছে।

ডাকার সম্মেলনে ঘোষণাপত্র : বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেই

থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত হয় সবার জন্য শিক্ষা সম্মেলন। জমতিয়েন সম্মেলনে বিশ্বের ১৫৫টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সেখান থেকে তারা সম্মিলিতভাবে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক আন্তর্জাতিক ঘোষণা আনুষ্ঠানিক অনুমোদন করেন। সম্মেলনে সকল মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিটি দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়েও একমত হন- মৌলিক শিক্ষার আসলে কোনো বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। যা প্রয়োগ করে সব জায়গায় এর চাহিদা অভিন্নভাবে পূরণ করা যায়।

জমতিয়েনের পথ ধরে বিশ্বজুড়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন ও বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষাবিদ সম্প্রদায় ও শিক্ষক সমিতিসমূহ একত্রিতভাবে পৃথিবীর ১৮০টি দেশে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা অভিযান তথা গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই) কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারই আলোকে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত সংস্থাসহ 'সবার জন্য শিক্ষা'র নীতি বাস্তবায়নের জন্য ৬টি লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। লক্ষ্যগুলো হলো : সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার।

মেয়ে শিশু, সংখ্যালঘু বংশোদ্ভূত শিশু ও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে, বাধ্যতামূলক, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

সকল শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা চাহিদা নিশ্চিত করা এবং তাতে

'আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় যে অর্থ ব্যয় হয়, তা অনেক দেশের চেয়ে কম'

অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা কি?

আবু হামিদ লতিফ : সার্বিক অবস্থা ভালো না। আর ভালো না হওয়ারও অনেক কারণ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা হলো একটি বিশাল কর্মকান্ড। এর প্রশাসন, অর্থায়ন ও শিক্ষা প্রদান কাজগুলোর সঙ্গে জড়িত বিশাল কর্মীবাহিনী। আর এ কর্মীবাহিনী প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নয়। অধিকাংশই জানে লক্ষ্য কি। মৌলিক শিক্ষা হলো প্রত্যেকের অধিকার। মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে আমরা আরেকটি বিষয় যুক্ত করেছি, তা হলো জীবনে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড '৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৫৩টি যোগ্যতা নির্ধারণ করে। সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়। পঞ্চম শ্রেণী পাস করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এ ৫৩টা গুণ থাকার কথা। কিন্তু থাকছে না। কারণ পাঠদানে যারা রয়েছে তারা সেই শিক্ষা দিতে পারছে না বা দিচ্ছে না।

২০০০ : কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে 'প্রাইমারি স্কুল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ নামে গত বছর একটি উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছে।

আবু হামিদ লতিফ : ঠিক আছে। সরকার বিভিন্ন প্রজেক্ট নিচ্ছে, ভালো কথা। এ প্রজেক্টের আগে 'প্রাইমারি স্কুল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-১' নামে আরেকটি প্রজেক্ট সরকার নিয়েছিলো। সেই প্রজেক্টের অর্জন কি? কিছুই না। বরং ব্যর্থ। এ প্রজেক্টও ব্যর্থ হবে। আর আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট নিচ্ছি দাতা দেশ বা গোষ্ঠীর চাপে পড়ে। এসব প্রজেক্ট তৈরি করে ডোনাররা, তাদের কনসালটেন্টরা এসব প্রজেক্টে কাজ করে। কিন্তু আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু ফলপ্রসূ তা কিন্তু আমরা ভাবি না। এটা ভাবার দরকার আছে। এগুনো তো সম্ভবই। তার আগে একটা বিষয় বলা দরকার, আমাদের এখানে এখন কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ে সমান সমান। এটা পজেটিভ। আর শ্রীলংকার পরেই আমরা। নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে এগুতে হলে দরকার সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

'১২ বছর পর্যন্ত সব শিশুকে অভিন্ন শিক্ষা দিতে হবে'

ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ

সাপ্তাহিক ২০০০ : আইপিআরএসপিতে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি কিভাবে দেখা হয়েছে?

আতিউর রহমান : আইপিআরএসপিতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো শিক্ষার মান, নারী শিক্ষা, ভোকেশনাল শিক্ষা এবং কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা। এখন আইপিআরএসপির কাজ চলছে। কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যাবে।

২০০০ : স্থানীয় প্রশাসন কিভাবে কাজ করবে?

আতিউর রহমান : স্থানীয় প্রশাসনকে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন প্রতিটি স্কুলে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

২০০০ : এ অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া কি হবে?

আতিউর রহমান : উত্তরণের জন্য শুধু টাকা দরকার নয়। অন্যান্য বিষয়ের ওপরও নজর দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন করতে হলে গ্রামের পরিবারগুলোর উন্নয়ন করতে হবে। আমি দেখেছি, একটি পরিবারের মাসিক বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ চলে যায় লাইটিংয়ে। এ ক্ষেত্রে গ্রামগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পারে সরকার। শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ক্লাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংযোগ সময় বাড়াতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, পৃথিবীর কোনো দেশে একসঙ্গে ৩-৪ ধরনের শিক্ষা চালু নেই। একমাত্র বাংলাদেশে আছে। যেমন সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন। এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে এবং ১২ বছর পর্যন্ত একই রকম শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষকদের পাঠদানের মান বাড়াতে হবে।

‘মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা আদিবাসী সন্তানদের মৌলিক অধিকার’

মেজবাহ কামাল
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : সুশীল সমাজ ও আদিবাসী সংগঠনের দাবি, আদিবাসী সন্তানদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আসলে এ দাবি কতটুকু বাস্তবসম্মত?

মেজবাহ কামাল : আদিবাসী সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হওয়া নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। এটা তাদের মৌলিক অধিকার। একটি শিশু শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে। এ কারণে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় হলে তার জন্য এ শিক্ষা অর্জন শুধু কঠিনই হবে না, অসম্ভবও হয়ে পড়বে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার বিপরীতে কথা বলার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। এটা অবশ্যই করতে হবে।

২০০০ : আসলে এ কাজটি করতে গেলে আমাদের কি কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে?

মেজবাহ কামাল : আমরা একটি গবেষণা করে দেখেছি, দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৯৪ শতাংশ বাড়িতে নিজ মাতৃভাষায় কথা বলে। এ থেকে বোঝা যায়, আদিবাসীদের কারো কারো ভাষা ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে। তারা বাংলা ভাষায় কথা বলছে। তাহলে ৯৪ শতাংশ আদিবাসী সন্তানের জন্য মাতৃষাভায় শিক্ষা অতি জরুরি। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, আদিবাসী সন্তানদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হলে তারা পড়ালেখায় অধিক আগ্রহী হবে। মাতৃভাষায় পড়ালেখা হলে তাদের মাতৃভাষার ওপর দখলটা বাড়বে। দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাটা তাদের মাতৃভাষায় হলে পরবর্তীতে বাংলা, ইংরেজি শিক্ষা সহজতর হবে। এসব বিবেচনায় মাতৃভাষায় শিক্ষা তো জরুরি। এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে সম্ভব? আসলে কাজটি করার জন্য প্রথমে যেটা দরকার তাহলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আমাদের মনে রাখতে হবে, এগুলো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর একটা অধিকার। এ বোধটা বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে তৈরি হওয়াটাই আগে দরকার। আদিবাসী সন্তানদের জন্য নিজস্ব মাতৃভাষায় টেস্টবুক করতে হবে। এ টেস্টবুকে তাদের জীবন সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অধিকসংখ্যক শিক্ষিত আদিবাসীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। দারিদ্র্য তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এ ক্ষেত্রে আদিবাসী সন্তানরা যাতে স্কুলে আসে তার জন্য পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দিতে হবে।

২০০০ : আপনি জানেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এ রিপোর্টে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও আদিবাসীর বিষয়টি কিভাবে এসেছে?

মেজবাহ কামাল : এ শিক্ষা কমিশন স্ববিরোধিতায় ভরা একটা রিপোর্ট। অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে পুরো শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িককরণের চেষ্টা হয়েছে। এর ফলে আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা আরো কঠিন হয়ে উঠেছে।

বুনিয়াদী, জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সকলের সমান অভিগমন নিশ্চিত হয়।

২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার, বিশেষ করে নারীদের সাক্ষরতা অন্তত ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং বুনিয়াদী ও তার পরের শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহণের প্রাথমিক সুযোগ নিশ্চিত করা।

২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা, শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে লিঙ্গীয় সমতা অর্জন এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে সকল নারীর জন্য মানসম্মত বুনিয়াদি শিক্ষায় পূর্ণ ও সুষম প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন, যার ফলে সবার পক্ষে অন্তত সংখ্যা গণনা, পড়তে পারা, পরিমাপ করতে পারা ইত্যাদি শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে ডাকার সম্মেলনে ঘোষণাপত্রকে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ গ্রহণ করা হয়েছে। ডাকার সম্মেলনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা পিইডিপি-২-এ নেই। ছক বেঁধে এগিয়ে যাওয়ার নেই পরিকল্পনা। অনেকে বলছে, পিইডিপি-১-এর মতো পিইডিপি-২ থেকেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। ডাকার সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সারা দেশে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন।

পিআরএসপি বনাম পিইডিপি-২

সরকার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের সুপারিশ অনুসরণ করে একটি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাক-পিআরএসপি তৈরি করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি করা হবে। জানা গেছে, প্রাক-পিআরএসপিতে দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্য অভিন্ন পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের সান্নিধ্যের সময় বৃদ্ধি করা হবে। পর্যাপ্ত বিজ্ঞানাগারের সুবিধা দেয়া হবে। অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটির কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাবহির্ভূত বৃত্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি ভাষা পারদর্শী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পিইডিপি-২-এ পিআরএসপিকে যথার্থভাবে অনুসরণ করা হয়নি। নেয়া হয়নি সমন্বয়ের উদ্যোগ। পিআরএসপিতে অভিন্ন পাঠ্যসূচির কথা বলা হলেও, পিইডিপিতে নেই। পিইডিপিতে কিভাবে পিআরএসপি লক্ষ্য অর্জন করা হবে, তার কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার শিক্ষা কমিশন তাদের শিক্ষানীতি সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে এ শিক্ষানীতির মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পিইডিপি-২-এর কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

অবৈতনিক হলেও : প্রচুর অর্থের প্রয়োজন

সরকার দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক করেছে। সংবিধানকে ভিত্তি

করে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার- এ কথা শুধু বাংলাদেশের সংবিধানেই নয়, পৃথিবীর সব ধরনের আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বীকৃত। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া, যা প্রারম্ভিক শৈশবে শুরু হয় এবং এর বিস্তৃতি বা পরিধি জীবনব্যাপী।

শিক্ষার মাধ্যমে শিশু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক মূল্যবোধে জাগ্রত হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মত প্রকাশের অধিকার অর্জন করবে।

সরকার শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করতে প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে চলছে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা। একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বসহকারে কাজ করছে। কিন্তু এতো কিছুর পরও বাস্তব চিত্র খুব উদ্বেগজনক সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও শিশু-কিশোরদের অনেকে স্কুলে ভর্তি হতে পারে না, বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্রেও যাবার ব্যবস্থা নেই। স্কুলে ভর্তি হলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই ঝরে পড়ে যায়। আবার কিছু আছে যাদের সম্পর্কে কোনো তথ্যই নেই, জরিপের মধ্যে ফাঁক-ফোকরের সুযোগে তাদের সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারে না। এই হারিয়ে যাওয়া ও মনে পড়াসহ সবাইকে শিক্ষার আওতায় নিয়মিত করতে পারলে কেউ বাদ যাবে না এবং শিক্ষার সর্বজনীনতা যৌক্তিক রূপ লাভ করবে।

বিভিন্ন জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ করে যে চিত্র পাওয়া যায় তা মর্মপীড়াদায়ক। গ্রাম অঞ্চলের চেয়ে শহরে বিদ্যালয়ভুক্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে, এমন শিশুদের বেশির ভাগ কৃষক পরিবার থেকে আসে। গ্রামভেদেও বিদ্যালয়ভুক্তির ভেতর অসঙ্গতি রয়েছে। এমনও গ্রাম আছে যেখানে নিট বিদ্যালয়ভুক্তির হার মাত্র ২০%। জরিপে দেখা যায় যে, ২০.২% স্কুলে গমনোপযোগী (eligible) শিশু (৩-১০ বছর) কোনো বিদ্যালয়ে যায়নি।

মাসিক সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা আয়ের পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৮০%। অন্যদিকে যাদের আয়সীমা ১০০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত, সেখানে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৪৬.৪২%। ২০০১-৭০০০ টাকা আয়সীমার পরিবারে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৮% এবং ৭০০০-এর ঊর্ধ্বে আয়সীমার শিশুদের ঝরে পড়ার হার শূন্য। অর্থাৎ পারিবারিক আয়ের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আরো জানা যায়, ঝরে পড়ার হার ৩৭.২৭% এবং পুনরাবৃত্তির হার ২২.৬৪%। ইউনিসেফের জরিপ অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী বয়সের প্রায় ১২ লাখ শিশু স্কুলে নেই, এদের মধ্যে ৫৩% মেয়ে।

এই শিশুদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ২.৪% বিদ্যালয় গেলেও ১০ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়ে। যেসব ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না তারা সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে এসেছে। এদের এক-তৃতীয়াংশের পিতা ও শতকরা ৮৫.১ জন মা কখনো স্কুলে যায়নি। দেখা গেছে, মাসিক সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা আয়ের পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৮০%। অন্যদিকে যাদের আয়সীমা ১০০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সেখানে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ৮%। ৭০০০ টাকার ঊর্ধ্বে আয়সীমার পরিবারের শিশুদের ঝরে পড়ার হার শূন্য।

যদিও সরকার বলছে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, বাস্তবে কিন্তু তা নয়। একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীকে নানাভাবে স্কুলে অর্থ দিতে হয়। পরীক্ষা ফি, বিভিন্ন চাঁদা সর্বোপরি বই বিনামূল্যে পেলেও কলম, কাগজ কিনতে হয়। উপর ক্লাসে উঠতে থাকলে এ ব্যয় আরো বেড়ে যায়। ফলে অতি স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর সন্তানেরা এ ব্যয়ের কারণে স্কুলে যাবার

‘নন-ফরমাল এডুকেশনে এনজিওদের সম্পৃক্ত করা উচিত ছিল’

কাজী রফিকুল আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আহছানিয়া মিশন
বিশেষজ্ঞ, নন-ফরমাল এডুকেশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগের পরেও কেন প্রাথমিক শিক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হচ্ছে না?

কাজী রফিকুল আলম : আসলে এর পেছনে নানা ধরনের কারণ রয়েছে। আমরা সবাইকে স্কুলে নিয়ে আসতে পারছি না। যারা আসছে তাদের মধ্যে অনেকেই ঝরে পড়ছে। যাদের স্কুলে যাবার কথা তাদের শতকরা ৭৯.৯ ভাগ স্কুলে যায়। আমরা এখনো ২০ ভাগ শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসতে পারিনি। যারা আসছে তাদের মধ্যে সাড়ে ২৪ ভাগ ঝরে পড়ছে। এই যে ঝরে যাচ্ছে, স্কুলে আসছে না, তার কারণ আমরা স্কুলকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারছি না। কেন আমরা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারছি না? কারণ প্রাথমিক স্কুলগুলোতে দেখা যায় ঘর নেই। ঘর আছে তো বেঞ্চ নেই। এসব নানা সমস্যা আছে। এসব সমস্যার কারণেই আমরা সমাধান করতে পারছি না।

২০০০ : ঝরে পড়া রোধ কমানোর জন্য আসলে কি করা উচিত?

কাজী রফিকুল আলম : সরকার আসলে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। মেয়েদের জন্য আলাদা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। গরিবদের জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু বৃত্তি দিলেই হবে না, এর সঙ্গে স্কুলের পরিবেশকে সুন্দর করতে হবে। স্কুলের শিক্ষকদের ছাত্রদের পড়ানোর জন্য মনমানসিকতা থাকতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষককে চাইল্ড ফ্রেন্ডলি বিহেভ করতে হবে। এসব করা সম্ভব না হবার কারণে ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হচ্ছে না।

২০০০ : সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পটিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

কাজী রফিকুল আলম : আসলে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুণগত মান বাড়ানোর জন্য যা করা দরকার তা প্রকল্পের মধ্যে আছে। সমস্যা হচ্ছে এ দেশে সবকিছু তো লেখা থাকে, এটা বাস্তবায়ন কতটুকু হবে তার ওপর নির্ভর করে। যারা প্রকল্প পরিচালনা করবেন- টিও, এটিও তাদের সবার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে ট্রেনিংগুলোর কার্যকারিতা। সব কিছু যদি ঠিকমতো হয় তাহলে এ প্রকল্প ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ঝরে পড়ার প্রবণতা হয়তো কমবে। কিন্তু যারা স্কুলে আসতেই চায় না, তাদের জন্য এ প্রকল্পে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। তাদের জন্য যে নন-ফরমাল এডুকেশনের ব্যবস্থা ছিল তা পিইডিপিতে রাখেনি। ফলে শতকরা ২০ ভাগ ছেলে যে আসছে না, তাদের জন্য এনজিওদের যে রোল ছিল তা মূল্যায়ন করা হয়নি। সুযোগ দেয়া হয়নি। প্রকল্পে নন ফরমাল এডুকেশনে এনজিওদের সম্পৃক্ত করা উচিত ছিল।

ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে না।

সবার জন্য শিক্ষা : প্রয়োজন পরিবেশ

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ডাকার ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য রয়েছে তবুও আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এখনো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে। এখনো হতদরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঝরে পড়ে নানা কারণে। জাতীয়ভাবে নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে এবং সামষ্টিক ক্ষেত্রে সমস্যাদি ছাড়াও স্থানীয়ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা রয়েছে। শিক্ষা বৈষম্য, মানসম্মত শিক্ষার অভাব ইত্যাদি তো রয়েছেই। এসব বিষয়ে অধিক জনসচেতনতা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে যেসব সমস্যা সমাধান করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনগুলো খতিয়ে দেখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি ব্যর্থতাগুলোও দেখতে হবে।

শিশুরা শিক্ষার পুরো অধিকার পাচ্ছে না। আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। গ্রাম ও শহরের শিশুদের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বৈষম্য, রয়েছে ধনী ও গরিব শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বৈষম্য। এ ক্ষেত্রে শিশুরা বঞ্চনার শিকার হলে শিক্ষার প্রতি তাদের অনাগ্রহ বেড়ে যায় এবং ঝরে পড়ার সংখ্যাও বেড়ে যায়। আর এই উল্লেখযোগ্য মাত্রার ঝরে পড়া রোধ করতে হলে এবং সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ গড়ে তোলা আবশ্যক।

সহযোগিতায় : **হাসান আজাদ**

ছবি : **খালেদ সরকার**

‘প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার ট্যাক্স রিভ্যাট সিস্টেম চালু করতে পারে’

রাশেদা কে চৌধুরী

নির্বাহী পরিচালক গণসাক্ষরতা অভিযান

সাপ্তাহিক ২০০০ : ডাকার সম্মেলনের অভিজ্ঞতা কি?

রাশেদা কে চৌধুরী : ‘সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা’ এই স্লোগান নিয়ে সেনেগালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর ১৮২টি দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। শিক্ষার বিষয়টি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বাস্তবতায় রয়েছে। দেশ অনুযায়ী বাস্তবতা ভিন্ন। সে কারণে পার্থক্যগুলো যাতে হারিয়ে না যায় আমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছি, সাউথ এশিয়ার মেয়ে শিশু শিক্ষার হারে আমরা এগিয়ে। তারপরও সম্মেলনে আমরা শিশু শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। শিক্ষার মান ও প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়টিও আলোচনায় বলিষ্ঠভাবে এসেছে। যেমন মেয়ে শিশু শিক্ষার বিষয়টি পাকিস্তানে কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে তার চিত্র উল্টো। বরং পাকিস্তান, আফ্রিকা থেকে আমরা ভালো আছি। আরেকটা ইস্যু আমরা তুলেছি- শিক্ষার জন্য সম্পদ সরবরাহ। এ ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশের জিএনপি (GNP) আড়াই ভাগ। সেখানে শ্রীলঙ্কায় ৭ ভাগ। মালদ্বীপও ৭ ভাগ।

২০০০ : কিন্তু পিডিবি-১ অর্জন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সেখানে পিডিবি-২ কতটুকু ফল বয়ে আনবে?

রাশেদা কে চৌধুরী : পিডিবি-১ থেকে পিডিবি-২ অনেক উন্নত। এর সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা অভিজ্ঞ। আগের কাজের ভুলগুলো পিডিবি-২ তে শোধরানো সম্ভব হয়েছে। তবে এই পিডিবি ২-এর দুর্বলতা হলো এটি বাংলাদেশ শিশু শিক্ষার পুরো ক্যানভাস মিস করেছে। এই প্রকল্পে সরকার শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে নিয়েছে। উপ-আনুষ্ঠানিক পুরো বাদ। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২০ লাখ শিক্ষার্থী এ প্রকল্প থেকে বাদ পড়লো। এ নিয়ে আমরা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছি। তারাও স্বীকার করেছে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমরা শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় কাজ করতে চাই। তো আমার কথা হলো পিডিবি-২ থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক বাদ পড়লো, তাহলে পিআরএসপিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এতে উপ-আনুষ্ঠানিকের জন্য কি করা হয়েছে।

‘প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করে তুলতে হবে’

রেজাউল করিম চৌধুরী, সেক্রেটারি জেনারেল, সুপ্র

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কাজ করেছেন। সেখানে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কেমন?

রেজাউল করিম চৌধুরী : উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা মূল ভূখন্ড থেকে খারাপ। উপকূলীয় ভূখন্ড মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা। সেখানে মূল শিক্ষকের পরিবর্তে বদলি শিক্ষক ক্লাস নেয়। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কারিকুলাম তৈরি করতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা বিল্ডিং নয়, বইও নয়। সমস্যা মূলত শিক্ষকের। আমাদের দেখতে হবে শিক্ষক যথাযথভাবে লেখাপড়া করাচ্ছে কি না। স্কুল থেকে ছেলে-মেয়েরা পাস করছে কি না। আসলে সমস্যাটা টাকার নয়, সমস্যাটা হলো জবাবদিহিতার। সমস্যাটা গভর্নেন্সের। আসলে জবাবদিহিটা হতে হবে জনপ্রতিনিধিদের কাছে, উপজেলার কাছে, ইউনিয়নের কাছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার দায়ভার দেয়া হয়েছে। এটা খুবই ফলদায়ক হয়েছে।

২০০০ : পিআরএসপিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে?

রেজাউল করিম চৌধুরী : পিআরএসপিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পিআরএসপিতে এমনও বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়ার পরই মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমার মনে হয়েছে এটা ঠিক না, সব স্তরে শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের শিক্ষার গুণগত মানের ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার দুর্বলতার কারণে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা কম উঠে আসছে। পিএসসির এক তথ্যে দেখা গেছে, এখন গ্রাম থেকে শহরের ছেলেরাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনে চাকরি পাচ্ছে বেশি। অথচ ২০ বছর আগে এ চিত্র ছিল না।